সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : তর্পণ-সন্তর্পণ

সুমন ভট্টাচার্য

প্রয়াণ-অপ্রয়াণ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত। এই সংবাদের প্রস্তুতি তো বিগত কয়েক বছর থেকেই ছিল। জন্ম : ১৯২৬। সুতরাং অশীতিপর। এখানে বিমূঢ়তা নেই, কিন্তু যাঁরা আটের দশক থেকেই মাত্র তাঁর পাঠক, এবং পঠনসীমায়, যিনি বদ্ধতার বিপরীত যাত্রার শিক্ষক, তাঁদের কাছে, এই নতুন শতকের বিত্তবৈভবের ক্রমিক প্রদর্শনীর জগতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রজন্মের মানুষেরা ছিলেন এক ভিন্নধর্মী আশ্রয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ, এই পাঠকদের অনেকেরই আশ্রয় হরণ করল। আসলে আশ্রয়টা বড়ো জরুরি — মানুষ আশ্রয়ের নিরাপত্তায় নিজস্বতার বৃত্তে নিজেকে সঁপে দিতে পারে। আশ্রয়হীন হলে, বা প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়কে নিজস্ব আশ্রয়ের পরিচয়ে মানতে না পারলে, সে আশ্রয় প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়ের বিরুদ্ধে দ্রোহীও হতে পারেন, কিন্তু একটি আশ্রয় থেকে বিচ্যুতির পর, নতুন আশ্রয়ের সন্ধান, একটা সময়ের পরে যেন, অসম্ভব বোধ হতে থাকে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, তেমনই এক আশ্রয় সাহিত্যের পাঠকের কাছে, যুক্তিবাদী পাঠকের কাছে।

একদা যখন বাংলা সাহিত্যটা বিশ্বসাহিত্যই ছিল, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পর্বের বাংলা সাহিত্যের পাঠক — যখন বহমান বিশ্বসাহিত্যের সম-তালে এবং সমতলে পঠিত হচ্ছিল বাংলা সাহিত্য। তাই তাঁর পাঠদৃষ্টিও আত্মস্থ করেছিল একটি বিশ্ববোধ। তাঁর সামনে যেন-বা মূর্তি পরিগ্রহ করছিল সাহিত্যপাঠের এমন একটি স্বরলিপি — যার সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত স্বরলিপির পৃষ্ঠাটি বারংবার পৌঁছে যাচ্ছিল — তীব্র বেসুরে, 'বেসুরায়'।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কি কখনো বিদ্রোহী সমালোচক বলে অভিহিত হয়েছেন? একদা, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কার্ড-প্রাপ্ত সদস্য ছিলেন। বিপ্লবের সক্রিয় প্রয়াসে গ্রেফতারও হয়েছেন। কিন্তু, সে পরিচয় দিয়ে, তাঁকে কি বিপ্লবী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলা যাবে? কিন্তু যদি বলা হয়, যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আদ্যন্ত বিপ্লবীই ছিলেন, তা-ও কি তাঁকে ভুল পরিচয়ে চিহ্নিত করা হবে? কারণ — একদা, যে প্রশাসনিক কাঠামোকে অস্বীকার করে, অধিকতর প্রদীপ্ত এক রাষ্ট্র — বাসভূমি — স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার যাত্রায় তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যবহারিক সক্রিয়তায় থাকেননি, কিন্তু সন্ধান তো করছিলেন, এক নিজস্বতর স্বদেশের — যার উপাদানও তাঁর প্রত্যাশিত স্বদেশের নির্মাণের যাত্রাপথ! যখন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিতার কালান্তর* লেখেন, যখন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* লেখেন, তখন, সেই বইয়ের পাঠক ছিলেন সাহিত্যপ্রীত মানুষজন, তাঁরাও সময়ের দাবিতে ক্রমশ অর্জন করা তাঁদের সাহিত্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, তাঁর চিন্তাভাবনার উজ্জ্বলতা! বিপ্লব ঘটে যাচ্ছিল, পাঠকদের পাঠক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই নীরবে।

যে পাঠক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা পড়লেন, তাঁর পক্ষে কিন্তু আর সম্ভব হবে না, কবিতার বিষয়ে বা উপন্যাসের বিষয়ে, বিশেষ করেই, পূর্ববর্তী লেখক বা লেখকদের আলোচনাকে গ্রহণ করা, পড়াও ! আর বাংলা সাহিত্যটা যখন থেকে, বাঙ্গালা অনার্স আর বাঙ্গালায় এম-এর মধ্যবিত্তমদির জগতের মুঠোয় আটকে গেল, তখনও দীর্ঘকাল নম্বরলুব্ধ জনগণ কিন্তু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করতে সাহস পাননি। কারণ, বিশেষণ-প্রবণ ও অলংকার ভক্তিচন্দ্রিকা-গদগদ মন্তব্যের অভ্যস্ততায় চালিত অধ্যাপক-পরীক্ষকবর্গ যুক্তিবাদী আলোচনা পছন্দ করেন না। কিন্তু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই তো শেষ পর্যন্ত যথার্থ পাঠমাত্রায় অবসিত হল সেই সমালোচনার ধারা। আর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অপ্রয়াত।

পরিসর-অপরিসর

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাবতে শেখান পাঠককে। তাঁর ভাবনার ভার চাপিয়ে দিতেন না। উপন্যাস কখন, যথার্থ উপন্যাসের পট থেকে, ঔপন্যাসিকের হাতের পুতুল হয়ে তার ধর্ম হারায়, আবার কখন তা অর্জন করে মহত্বের মাত্রা, তার একাধিক পাঠরীতি, পাঠপদ্ধতিকে তো চেনাচ্ছিলেন তিনি। যেমন 'শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা' প্রবন্ধে :

> শরৎচন্দ্রের মহিম-পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি হল; মহিমের ... কোনো এক সুনির্দিষ্ট পটভূমি নেই। এই পটভূমিগত অস্পষ্টতা উপন্যাসটির কমবেশি সব চরিত্রেই বিদ্যমান। ... মহিমের মত সাদামাটা বাঙালি যুবকের কাছে ছয়ঘরা-পিস্তল কেন থাকে আমরা জানি না — কিন্তু এই পিস্তলের সঙ্গে মহিমের ব্যক্তিত্বের কোনো মিল নেই।
> অথচ মহিমই এ উপন্যাসের নায়ক।
>
> *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮

আবার 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে লেখেন :

> আশ্চর্য এই ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ, ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান। এই গ্রন্থের নায়ক দেবু ঘোষ শুধু অব্রাহ্মণ নয়, চাষীর ঘরের ছেলে। গ্রামীণ এলিটদের সম্বন্ধে, গ্রাম-অর্থনীতির প্যাটার্ন সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান তীক্ষ্ণ। ছিরে ঘোষের মত চরিত্র-কল্পনার সাহায্যে তারাশঙ্কর আমাদের ঠিকই ধরিয়ে দেন যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সত্ত্বেও গ্রামীণ হিন্দুসমাজে একটা open status group-এর সৃষ্টি হচ্ছিল। তখনও গ্রামে 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী' শ্রেণী হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেনি। 'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর মহৎ ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত নিরপেক্ষতায় ও নিরাসক্তিতে ছিরু শ্রীহরি ঘোষে রূপান্তরের কথা এবং তার নবার্জিত শ্রেণী চরিত্রে চিহ্নিত হওয়ার চলচ্ছবি বর্ণনা করেছেন। অদূরবর্তী কঙ্কণার ব্রাহ্মণ বাবুদের শ্রেণীচরিত্রের কথাও বাদ যায়নি।
>
> পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৪৫

উপন্যাসের আলোচনায় যে প্লট আর ক্যারেকটার-কে প্রাধান্য দিয়ে বা কখনো অনেকটাই

আলগাভাবে মনস্তাত্ত্বিকতার বুড়ি ছুঁয়ে এগোত ওই, বিশেষণ-প্রবণ আলোচনা, সেখানে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যকে গড়তে চাইলেন অবস্থানের প্রেক্ষিত থেকে, সমাজ আর সমাজ সাপেক্ষতার বহতায়, কোন ভাবনা বা আচরণ — সময়ের 'টেনশন' থেকে উঠে আসে, তা কেবলমাত্র ইতিহাসবোধ থেকেই যথাযথভাবে অনুভূত হয়। 'হৃদয়ে বিরস গান' গেয়ে চলা যে বর্তমান, আখ্যানের প্রেক্ষাপট গড়ে তোলে, বা লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে, সেখানেও যে ইতিহাসের তথা সমাজ আর পরিবারের ইতিবৃত্তের যাত্রাপথ — তাকে দিয়েই বুঝতে হবে আখ্যানকে। কিন্তু এই বিচার, কখনোই যে একই নিয়মের গণিতে চালিত হবে এমনও নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পাঠরীতি অনেকটাই তো গৃহীত হতে থাকছিল — ধীর মন্থর পদক্ষেপে। অলোক রায়, *দিবারাত্রির কাব্য* পত্রিকার সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান সংখ্যা-য় (জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫) 'রবীন্দ্রউপন্যাস নিরীক্ষা ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়' (পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৯) প্রবন্ধে তাঁর উপন্যাস-আলোচনার দৃষ্টিকোণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, বস্তুত, অধ্যাপক অলোক রায়, তাঁর প্রবন্ধে, তাঁর নিজস্ব সুশোভন ভদ্রতায়, যে বিষয়টি চিনিয়ে ছিলেন, তা, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার অপরিহার্যতা, যা বাতিল করে দিয়েছিল পূর্ববর্তী আলোচনার রীতিকে। অলোক রায়, তাঁর যথাযথ ও অতি-সংযত বাক্য বিন্যাসে চিনিয়ে ছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা সমালোচনার কালান্তরের কথাটি।

আসলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত এবং কৌতুকবোধ সমৃদ্ধ মননের অধিকারে, সমালোচনার কেঠো পরিসরকে, যেভাবে রসাবিষ্টতায় নিয়ে আসেন, তা উত্তরকালের আলোচকের কাছে তো একইসঙ্গে হয়ে যায় সমৃদ্ধি আর সংকটের যূথযাত্রা। কারণ, সেই পাঠ তাঁকে/তাঁদেরকে সমৃদ্ধ করেছে, এবং ভাবনার যে সমগ্রতায় তিনি ব্যাপ্ত হয়ে যান, সেখান থেকে স্বতন্ত্র পরিসরে, তাঁর পঠিত সাহিত্যকে আবার পড়া যাবে কি না — তা হয়ে যায়, যেন সংকটের ভবিতব্য!

এই রসাবেশ — হাস্যবোধ, কৌতুকবোধ তো তাঁর অন্যতম চারিত্র্য। নতুন সাহিত্য ভবন থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল *আরও সরস গল্প* — অসামান্য ছিল সেই নির্বাচন, আর অসামান্য ছিল তাঁর ভূমিকা। হাস্যবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে, তিনি জীবনানন্দের সেই সুবিনয় মুস্তফির শরণ নিয়ে লেখেন, ইঁদুর শিকার করে ওঠা বেড়াল আর এর সঙ্গে বিড়ালের মুখে দংশিত ইঁদুরটিকে একই সঙ্গে হাসানোর অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী সেই যুবা-ই হয়তো-বা হাস্যরসের বা তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর ফলাফলের পরিচয়, তার একক! আবার তাঁর আরও একটি ভাষ্যও তো বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে, বহুজনের লেখায়, স্বল্পবিদ্যা সম্বল বুদ্ধিমানের কথাটি। একটি যুবকের পড়াশোনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরটি এরকম হয় যে, বিদ্যাসাগর মশায়ের ওয়র্কস-এর ভল্যুম নিয়ে খুবই নাড়াচাড়া করে — তাঁর ওয়র্কস দু-এক ভল্যুম পড়াও আছে — অস্যার্থ, বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ! আসলে এই সরসতার কারণেই, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সর্বদাই একটি বাড়তি আকর্ষণে এগোয়। তা পণ্ডিতের ষণ্ডশক্তি নিয়ে ধাবিত হয় না — পাঠক অনেকটাই স্বস্তিসহ সময়ে অসময়ে বসে যান, বসে যেতে পারেন, তাঁর যে-কোনো লেখা নিয়েই। আসলে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারিত্র্যে বসবাস করেন

কবি-উপন্যাসলেখক-গল্পকার এবং পুনশ্চ এবং রম্যরচনার সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই রম্যরচনাকারের স্বধর্ম তাঁকে অনেক এমন দিকও চেনায়, ভাবায়, যা সচরাচর সমালোচক-সত্তার চলতি সড়কের পথিকের নজরে আসে না। ধরা যাক, তাঁর *উত্তরপ্রসঙ্গ* বইয়ের একেবারে আলাদা ধরনের লেখা 'রামকৃষ্ণের অন্তঃপুরে' (পৃষ্ঠা ২১১-২২৭), একটু আলাদাভাবে হয়তো শুরু করা যেত, কিন্তু প্রচলিত ঠাট দিয়েই শুরু করে, তিনি একটু একটু করে এগোন, পাঠককেও নিয়ে আসেন, উদ্দিষ্ট বা প্রত্যাশিত কালপটে। শুরু করেছিলেন এভাবে :

> ঊনবিংশ শতকে সামাজিক রূপান্তরের যতটুকু প্রক্রিয়া যেখানেই ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে তার মৌল প্রেরণা এসেছে দেশাচার বা শাস্ত্রাচার নির্দিষ্ট ছকের বিরুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। বিদ্যোদ্ধত ছাত্রই হোক, অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী মনীষীই হোন, তাঁরা তাঁদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান খুঁজেছিলেন, খুঁজেছিলেন আপন আপন ব্যাখ্যামত পুরুষার্থ — সনাতন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।
>
> পৃষ্ঠা ২১১

আর এই চ্যালেঞ্জের অংশী হয়ে আসেন, অংশী করেই দেখেন তিনি রামকৃষ্ণকেও। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ লিখলেন না, কিন্তু সেই 'শ্রী'-র স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রয়োগ কত অমোঘ তাকে চেনান :

> তিনিও ঠাকুর, 'টেগোর' নন। তিনি মূলত পুরোহিত বটে, কিন্তু পৌরোহিত্য তাঁর 'ফোর্টে' নয়। তিনি বক্তৃতা করেন না, তিনি উপাসনা পরিচালনা করেন না। লেকচারে তাঁর গভীর অনীহা, তিনি চেয়ারে বসে, তক্তাপোষে বসে বা মাটিতে বসে গল্প করেন যার প্যাটার্নটা শ্রেষ্ঠার্থে গ্রামীণ। অর্থাৎ তিনি কিছুতেই পৃথক হবার জন্য ব্যাপ্ত ছিলেন না।
>
> পৃষ্ঠা ২১৫

সদর ভেঙে যেন তাঁর ভাষাও পাঠককে নিয়ে যায় অনেকটাই ঘরোয়া এক পারিবারিকতায়। তাঁর পাঠককেও তো তিনি হাতে করে তুলে দেন — তাঁরই আসরে শামিল হওয়ার সেই সমানাধিকার। সেই পরিসর। প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের যে ধাঁচা গেড়ে বসে, যা যুক্তিগ্রাহ্যতার দাবি থেকে সরে এসে 'গুরু' বাদের, অবশ্যমান্যতার অনুজ্ঞা হয়ে যায় — তাকে বরদাস্ত করতে নেই। ইয়ং বেঙ্গল থেকে রামকৃষ্ণ — দুই বিপরীতের অন্তরের স্বধর্ম তাঁকে নিয়ে আসে দুজনের পরিমণ্ডলী আর অভিঘাত সঞ্চারের ক্রিয়াগতিকে ভিন্নতর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবোধ দিয়ে বুঝবার অভিনবত্বে। আর তাঁর পাঠকরা তো ধারাবাহিক ভাবেই দেখে আসে যে, নূতনতর, অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য নূতন দিগন্ত তাঁর চোখে ধরা দিলে, তবেই না তিনি লিখেছেন! পাঠকের কাছে, তাঁর লেখা সমৃদ্ধি হয়ে দেখা দেয় — কারণ, পাঠদৃষ্টিকে তা চালিত করত নানারকম নূতনত্বে। আবার সংকটও ঘনিয়ে তুলত সেই লেখাই — এই পূর্বোক্ত কথাটিকে এইবার অন্যতর গ্রহণ ও প্রত্যাহারের প্রসঙ্গটি আসে যে, পরিসর তিনি যেমন হরণ করেন, তেমনি সেই হরণের অভ্যন্তরেই রেখে দেন তাকে অতিক্রমের মন্ত্রবীজ। কারণ, তাঁর পাঠও তো আচার্যের বেদী থেকে নিক্ষিপ্ত সুভাষণমালা বা উপদেশপ্রবাহ নয়। তাঁর

[illegible] অংশ। এ যেন তাঁর নৈহাটির বাড়ির একতলায় তাঁর বৈঠকখানা। কোঁচা নয়, ধুতির এক [illegible] টেনে কোমরে বাঁধা, গায়ে গেঞ্জি, বা শীতের দিনে চাদর গায়ে তিনি বসে কথা বলছেন, সামনে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও 'সহাস্য সমানাধিকার'। অধ্যাপক তিনি। জানতেন, কোন পদ্ধতিতে অনধিকারীকেও করে তুলতে হয় সমানাধিকারী! আর এভাবেই তো গড়ে উঠতে থাকে, তাঁর উত্তরপ্রজন্মের জন্য পরিসর!

পাঁচ অনর্চিত

এরকম একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, লেখক যাচ্ছেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি, পেছনে ভারবাহীর মাথায় এক ঝুড়ি থান থান খান পনেরো বই। কপি নয়। একই বইয়ের পনেরো খণ্ড, উপহার দেবেন বন্ধুকে, বইটির নাম : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঁচমিনিট। এই পাঠকের সঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন কোনো ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যে স্মৃতিচারণের দাবি তোলা যায়। কিন্তু তাঁর বাড়িতে একাধিকবার উপস্থিতি, তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। এই পাঠকের পিতাঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, আর সেইসময় প্রায় গোগ্রাসে পঠিত হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ, তাঁর উপন্যাসও। বইয়ের লাইনের পর লাইনে জমে যাচ্ছে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ, আর মার্জিনে নানান প্রশ্ন, কখনো-বা তাঁর ভাষ্য-বিশ্লেষণ নিয়ে বন্ধুমহলে যে কথা-কাটাকাটি চলে, কলেজের শ্রীকুমার-প্রীত অধ্যাপকের, ওই লেকচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে, সবই যেন নিরসন [illegible] দুটি কালান্তর নামা বইয়ের পাতায়। ১৯৮১-র *শিলাদিত্য* পত্রিকার অগাস্ট সংখ্যা আবার খুঁজে পেতে পড়তে হয়েছে, তাঁর সমরেশ বসুকে নিয়ে লেখা 'অন্য সমরেশ'। সেখানে শিরোনামের নীচে লেখকের নাম ছিল না। দরকারও ছিল না। খুবই দক্ষ কোনো ধর্মপ্রচারকের মতো, চাট্টি আটপৌরে কথা দিয়ে দিয়ে, গড়ে উঠেছিল এক ব্যক্তি সমরেশ বসুর দৈনন্দিন — তাঁর নিভৃতি, তাঁর 'অন্তঃপুর'। হয়তো অনেকজনই সেই লেখা থেকে প্রথম আগ্রহী হয়েছিলেন সমরেশ বসুর লেখা পড়বার জন্য, নতুন করে। লেখাটির একদম শেষে, কোনোরকমে ছাপা হয়েছিল লেখকের নাম। কিন্তু সেই লেখা পড়তে পড়তেই তো মনে হচ্ছিল, কে এই লেখক, যিনি এমন করে চেনান আর এক লেখককে? তিনি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে লেখার সঙ্গে অনেকগুলি আলোকচিত্র ছিল সমরেশ বসুর। কিন্তু তাঁর বিষয়ে লেখকের ছবি তো নেই। খুবই ইচ্ছে ছিল লেখককে দেখবার। অন্তত ছবি। কে ছাপবে সমালোচকের ছবি? একদিন পিতাঠাকুরই জোর করলেন, তিনি যাবেন, তাঁর বাড়ি, সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন পরিচয়ে সে যাবে? সেই ধাড়ি ছেলে — যাবে বাপের ল্যাংবোট হয়ে? পিতাই বললেন, ছাত্রের পরিচয় নিয়ে যাওয়ার জন্য, সুবীর রায়চৌধুরীর কাছে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে, যেটুকু যাতায়াত, সেইটুকুই বলা হবে। তাই বলা হল। আর এক লহমায় ম্যাজিক! হাত ধরে তিনি বসালেন। 'তোমার যিনি শিক্ষক তাঁর মতো মহৎ মানুষ, সহৃদয় ও সাহিত্যবোধসম্পন্ন মানুষ খুবই কম।' কথাগুলো তো মাথায় গাঁথা। বললেন, '*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* তখন লেখা চলছে — উনি খুবই উৎসাহী ছিলেন, আগ্রহী ছিলেন, এই বইয়ের নাম তো তাঁরই দেওয়া।' আরও বলেছিলেন, পরে তা লিখেওছেন, *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর

স্মৃতিচারণে, যে, তাঁর উপন্যাস যখন বেরোতে আরম্ভ করে, সমরেশ বসুর সঙ্গেই মনোমালিন্য ঘটছিল। সমরেশ বসু অভিযোগ করছিলেন, তাঁর প্লটেই উপন্যাস লিখছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়! সেইসময় তাঁর পাশে ছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী — বলেছিলেন, 'সমরেশ বসুর প্লট আর দৃষ্টিভঙ্গি, উপন্যাস বা গল্পকে এগিয়ে নেওয়ার থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস একেবারেই আলাদা!' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, আর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল তাঁর চোখ।

তখন, একটি বইয়ের কাজ চলছিল তাদের বন্ধুদের। একটি করে বিশেষ কবিতা নিয়ে নিবিষ্ট আলোচনার সংকলনের। সাহস পেয়ে অনুরোধ করা গেল বিষ্ণু দে-র 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' কবিতাটি যদি আলোচনা করেন : 'নাঃ আর পারবো না। ভাবনাচিন্তা আর কবিতায় সেভাবে শানাচ্ছে না! কবিতার জন্য, কবিতার কথা ভাববার জন্য যে মনটা লাগে, সেটা যেন ফসকে যাচ্ছে বারবার। এখন তো তোমরাই লিখবে। আমরা পড়ব। বিষ্ণু দে-র কবিতার যে কূট তির্যক চাল, তা নিয়ে আগের ভাবনার সঙ্গে মাঝেমাঝেই ভাবনার গরমিল হচ্ছে।' — 'সেটাই লিখুন।' — 'না — ওটার জন্য একরকমের তারুণ্য লাগে, ওটা আর নেই।' 'জল দাও' যে প্যাশনে পড়েছিলাম, তা নিয়ে লিখেছি — ওই মনটা তো নেই। এখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের কিছু খুঁটিনাটি, আর হ্যাঁ — উপন্যাস নিয়ে ভাবনাটা জেঁকে আছে। আর লিখবার তো একটা গায়ের জোরও লাগে না কি!' সালটা ১৯৯১-এর অগাস্ট — বাইশ বছরের ব্যবধান — উদ্ধরণচিহ্ন ব্যবহারের মান কতটা রক্ষিত তা নিয়ে সংশয়ের জায়গা আছে, কিন্তু কথাগুলো এরকমই ছিল। তারপরেই — পিতার প্রতি 'কেমন যেন একটু একরকমের ঠেকছে, ইটি কি শুধুই সুবীর রায়চৌধুরীর ছাত্র, না আরও কিছু কথা আছে?' আলোচক-লোচনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সুতরাং পিতাকেই বলতে হল, 'নিজের পরিচয় ছাড়া, আমার পরিচয়ে আসতে সংকোচবোধ করছিল —' কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়, আজ এসে একবার দেখেশুনে গেলে, এরপর স্বেমহিম্নি-তেই দেখা দিয়ো, অপেক্ষায় থাকব।'

বন্ধু মনোজ ভোজের, অধুনা অধ্যাপক মনোজ, সম্পাদনায় বেরোল *কবিতার অভিষঙ্গ*। এবার সেই বই নিয়ে, মনোজকে নিয়ে পুনর্বার তাঁর বাড়িতে। এবার অভ্যর্থনা একটু অন্যরকম। 'কী ব্যাপারে আসছ? লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বার করছ — লেখা চাই? — না হবে না।' দুটি নিমেষেই ম্লান মূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কি দয়া হল? 'কোথ থেকে আসছ?' — 'কলকাতা থেকে। আপনাকে একটা বই দেব।' — 'বই দেবে? বেশ — বেশ।' *কবিতার অভিষঙ্গ* বইটি একটু উলটে-পালটে দেখে বেশ খুশি, 'বেশ — ভালোই তো করেছ, তা এবার —' — 'এরপর ছোটোগল্প নিয়ে এরকম একটা বই করবার কথা ভাবছি। আপনার লেখা চাই।' — 'তোমাদের ভাবনা আছে, যত্নও আছে। দেব, আচ্ছা শীর্ষেন্দুর "উত্তরের বারান্দা" গল্পটা নিয়ে লিখলে হবে?' বলাবাহুল্য হবে তো বটেই। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি — অর্ধেক রাজত্ব জয় তো ওখানেই। 'আর কে কে লিখছেন?' সেই সংকলনে লিখেছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী, রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সুবীর রায়চৌধুরীর কথা শুনে আবারও উল্লসিত। পূর্ব-আলাপনকে স্মরণ করাবার কোনো চেষ্টা ছিল না। কিন্তু, এবার তিনিই চিনলেন। বললেন, 'আমরা পুরোনো দিনের মানুষ একটানে বড়ো

করে লিখতে আমাদের আটকায় না। লেখা দেব। দু-মাস পরে আসবে।' না, অনেক দু-মাস গড়িয়েছে লেখা পাওয়া যায়নি। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ধনঞ্জয় দাশের পদ্ধতি। তাঁর বাড়ি এসে, বলেছেন জলখাবারের কথা — তাঁর বাড়ির পাশেই, গঙ্গায় স্নান করে এসে খাবেন, দিন কতক থাকবেন তিনি, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখতে বসিয়ে দিয়ে, আর লেখা নিয়েই যাবেন — তার আগে নয়। তখন *অনুষ্টুপ*-এর সেই মার্কসবাদ আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে সংখ্যা বেরোবে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তো থাকতেই হবে!

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলবার কিছুটা পরিসর পাওয়া গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করতেন, আর সকলের লেখা পাওয়া গেছে কি না, বিশেষত সুবীর রায়চৌধুরীর। সুবীর রায়চৌধুরীর লেখা পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বরে। তারপরে অক্টোবর মাসে তাঁর মৃত্যু, দুমড়ে দিয়েছিল অনেকটাই। সুতরাং, তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে যাওয়ার দিনের ব্যবধান বাড়তে থাকে। ১৯৯৪ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকীর সভায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা। গিয়ে জিজ্ঞাসা করবার সময়, একবার মনে হল, বয়স্ক মানুষ, যদি ভুলে যান! 'চিনতে পারছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'হাড়ে হাড়ে'। হা-এর ওপর একটু টান লাগিয়ে সেই উত্তর, আবারও সেই মজলিশি কথককে চেনায়, যিনি রসবোধকে মর্যাদা দিতেন সবার আগে। একটি সূত্র থেকে, তাকে অনুষঙ্গের মায়ায় আঁকড়ে নিয়ে যেতে পারতেন অন্য এক প্রসঙ্গের খোলা বারান্দায় — তারপর আবারও ঘরে ঢুকে আসা, মানে ফেরার এক অসামান্য গায়কি! এ তো তাঁর সমালোচনারীতিরও অন্যতম ধর্ম। আলোচনারীতিরও। ধরা যাক, নতুন সাহিত্য ভবন থেকে, তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত *বৈষ্ণবপদরত্নাবলী*। তিনি যেমন রামকৃষ্ণকে চিনতে চান ডিরোজিয়ানদের সমতলে, তেমনি বৈষ্ণবপদকেও চিনিয়ে দেন আধুনিক কবিতারই স্বরূপে। বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে তাকে নিয়ে যান বিশ্বপটের মুক্তিতে :

> অসামাজিক প্রেম বলেই মিলনেও যেন চরম অতৃপ্তি — ক্রুবাদুরদের গানে এবং বৈষ্ণবদের কবিতায় এই বোধের ব্যবহার ঘটেছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৈষ্ণব এবং ক্রুবাদুর কবিরা সকলেই নারী এবং পুরুষ উভয়ের ভূমিকাতেই কথা বলতে পারেন ... :
>
> এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
> সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।।
> রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
> দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।।
>
> অজ্ঞাতনামা ক্রুবাদুরের কণ্ঠেও রাত্রি প্রভাতের বেদনা :
>
> Oh would to God night might forever stay
> And my friend never again be far away,
> And the watchman never spy the dawn of day!
> Oh God! Oh God! How quickly dawn comes round ...

এই অকৃত্রিম অনুভূতির জন্য বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কাব্য-সম্ভারকে জন-মনোগ্রাহী করে তুলতে পেরেছিলেন। সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কনভেন্‌শনের চর্চায় আবেগকে পোষমানা বাণী করে তোলেননি।

পৃষ্ঠা ১৩-১৪

আসলে এই কবিতার প্রসঙ্গ তাঁকে কতটা উদ্দীপিত করত, তাকে আরও উষ্ণতায় বুঝবার জন্যও ওই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের একটু দরকার ছিল। কারণ, কবিতা তাঁর কাছে যেন বা সাহিত্যযাত্রারই প্রাণভোমরা। কবিতার মূল্য তো তাঁর কাছে সর্বাধিক। সর্বস্বতর। 'সোনার তরী' কবিতার প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছিলেন যে মিলের খাতিরেই ঢেউগুলি নিরুপায় হয়েছে। একথা মানলে অনেকখানি কবিতা হারিয়ে যায়। নিয়তির মতো নাবিকের নিষ্ঠুরতার বা উদাসীনতার কাছে ওই করুণ কৃষক পরিশেষে ত্যক্ত হবে এক অনুপায় শূন্যতায়। তৃতীয় স্তবকে নাবিকের প্রথম আবির্ভাবে 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে' — শেষ স্তবকের করুণ মিনতি ও কঠিন প্রত্যাখ্যানের পূর্বচ্ছবি। সে যেন অদৃষ্টের মতোই নির্বিকার, জড়প্রকৃতি ঢেউ, এবং মানুষ-কৃষক, কারো প্রতি তার কোনো মমতা নেই। বাঁকাজল, নিরুপায় ঢেউ, সকালের মেঘার্ততা — সবমিলিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক অর্থময়তা — যা কবিতার শব্দে নেই, অর্থে নেই। তা শুধু এ দুয়ের সহযোগিতা-সম্ভব।

'কবিতার ভাষা' *বাংলা কবিতার কালান্তর* পৃষ্ঠা ২৩

বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিকোণকে সবিনয়ে অতিক্রম করে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আলোচনা শেখাল, সমস্ত আলোচনাই শেষপর্যন্ত বোধহয় অসহায়ভাবে সীমাবদ্ধ — পাঠককে নিজস্বতার আঁচে-ভাপে সর্বদাই আবিষ্কার করে নিতে হয়, সমস্ত লেখককে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

পাঠকের কাছে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত হয়েছেন, পঠিত হয়েছেন, অর্চিত হয়েছেন। পাঠক্রম-তাড়িত সেই প্রশ্নোত্তর নির্মাণের পর্যায়ে একদা তিনি ছিলেন ব্রাত্য — অধুনা অন্যতম আশ্রয়। তাই তাঁর *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*-এর বারংবার সংস্করণ হয়! কিন্তু *গোলাপ হয়ে উঠবে* বা *তিনতাসের খেলা*-র মতো অসামান্য লেখা আটকে থাকে অন্ধকারে! পাওয়া কি যাবে তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ *প্রিয় প্রসঙ্গ, কুয়াশার রঙ* আর *নীলরাখী* উপন্যাস? অথবা *কবিতা কল্পনালতা*-র মতো প্রবন্ধের বই? আর যে-ভাবে *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* সংস্করণের মুখ দেখে, তা তো অপরাপর পাঠক্রম-লাঞ্ছিত আলোচনার বইয়ের সমধর্মী! এভাবে অর্চিত হওয়ার নিষ্কৃতিতে শেষত অনর্চিত করার অধিকার থাকে কি? আবারও তিনি পঠিত হোন — পাঠকের কাছে — আসুক তাঁর রচনাসমগ্রের অধিকার — তবেই না তাঁর অর্চনা সম্ভব, তাঁর প্রবাহের উত্তরাধিকারের বহতা!